

সামন্ততন্ত্র

সামন্ততন্ত্র

সামন্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণির উপাধি, যারা রাজার অধীন স্থানীয় শাসক। রাজসামন্তও এক ধরনের শাসকের উপাধি যিনি রাজার প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় শাসক ও সামন্ত। সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের অন্যান্য উপাধি ছিল সামন্তাধিপতি; মহাসামন্তাধিপতি; সামন্ত-প্রতিরাজা ইত্যাদি।

আদি মধ্যযুগীয় (চার থেকে বারো শতক) ভারত, তথা বাংলায়, সামন্তপ্রথা ছিল শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় বহনকারী চিহ্ন। অবশ্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'সামন্ত' শব্দটি প্রতিবেশী রাজাকে নির্দেশ করে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজার পক্ষে বা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যুদ্ধ করার শর্তে ভূস্বামী বা জমিভোগকারী প্রজা অর্থে 'সামন্ত' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত গ্রন্থে (প্রথম শতক)। 'বৃহস্পতিস্মৃতি' গ্রন্থে 'সামন্তদের সামরিক ও অন্যান্য পরিসেবার বিনিময়ে রাজা কর্তৃক ভূমি প্রদানের ব্যবস্থার কথা সুপারিশ করা হয়েছে। 'হর্ষচরিতম্' গ্রন্থে সামন্তদের সাতটি স্তরের উল্লেখ রয়েছে। এসব উল্লেখের পাশাপাশি ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রশাসনে সামন্ত, মহাসামন্ত, রণক, রাজপুত্র, রৌতদের যে অসংখ্য উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শাসনব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুদের বিশেষ অবস্থান।

সর্বভারতীয় ক্ষমতার অধিকারীর অনুপস্থিতিতেই অসংখ্য আঞ্চলিক শক্তিদ্রদের উত্থান ঘটেছিল বলেই মাক্ষীয় পন্ডিতবর্গ মত প্রকাশ করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার উন্মেষের কারণেই শাসন ব্যবস্থায় এ পরিবর্তন ঘটেছিল। ডি.ডি. কোশাম্বির মতে এ নতুন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল দু'টি পর্যায়ে: (ক) উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে, যা ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়। সে সময় অধিরাজার সাথে তার অধীনস্থ স্বশাসনিক সামন্তপ্রভুদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল; মাঝখানে ভূম্যধিকারীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। (খ) সামন্ততন্ত্রের আরো জটিল ব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে নীচ থেকে উদ্ভাবিত সামন্ততন্ত্র, যে ব্যবস্থায় গ্রামীণ ভূস্বামীরা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজা ও কৃষকশ্রেণি মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে ক্ষমতাসালীর ভূমিকা পালন করতে থাকে। এদের কারণেই রাজনৈতিক অবকাঠামো ধীরে ধীরে খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়ে। চার থেকে সাত শতকের মধ্যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে এ দ্বিপার্যায়িক বিকাশকে অবশ্য অনেক মাক্ষীয় ঐতিহাসিকই সমালোচনা করেছেন।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে ধ্রুপদি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন আর.এস. শর্মা। তিনি তিন থেকে বারো শতকের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের বিকাশে তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন: (১) ৩০০-৬০০ শতকের মধ্যে উন্মেষ; (২) ৬০০-১০০০ শতকের মধ্যে বিকাশ এবং (৩) ১০০০-১২০০ শতকের মধ্যে উৎকর্ষ অর্জন এবং একই সাথে উক্ত ব্যবস্থার মধ্যে ফাটলও দেখা দিয়েছে। শর্মা পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সাথে সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক অবকাঠামোর যোগসূত্র দেখাতে চেষ্টা করেছেন। খ্রিস্টীয় চার শতকের দিকে, যখন প্রধান পুরাণসমূহ তাদের পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তখন পৌরাণিক বর্ণনায় রাজনৈতিক ক্ষমতাদ্রদের দুর্বলতার চিত্রও পাওয়া যায়। ওই সময়ে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, শূদ্র সম্প্রদায় কর্তৃক ক্ষমতাদ্রদের প্রতি অমান্যপ্রবণতা ও কলিযুগে ধর্মকে হীন মনে করা- এসবই চার শতকের দিকে এক সামাজিক সংকটেরই ইঙ্গিত দেয়। শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা লোপ পাওয়ার মধ্যে এ সংকটের রাজনৈতিক প্রকাশ দেখা যায়। তারা তাদের আইনসম্মত অধিকার আদায় করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা ধর্মীয় শ্রেণিকে, প্রধানত: ব্রাহ্মণদেরকে ভূমিদান করতে এবং সাথে সাথে তাদেরকে প্রশাসনিক ও আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান করতে বাধ্য হয়। ফলে এই দান গ্রহিতারাই রূপান্তরিত হয় স্থানীয় ক্ষমতাবান শাসকে। আর্থিক অবস্থার অবনতি ও মুদ্রার স্বল্পতার কারণে রাজার পক্ষে রাজকর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে; বিনিময়ে রাজা তাদের ভূমিদান করতে বাধ্য হয়। এভাবে সৃষ্টি হয় পার্থিব দান গ্রহিতা শ্রেণির। লিপি প্রমাণের (আট শতকের) ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে বিহারের হাজারিবাগ এলাকার গ্রামবাসীদের পক্ষে কিভাবে তিন ব্যবসায়ী ভ্রাতা রাজার প্রতি অবলগন/ অবলগক প্রদর্শন করেছিল এবং রাজা ব্যবসায়ী ভ্রাতৃত্বকে স্থানীয় সামন্ত বলে স্বীকৃতি দান করেছিলেন।

আমাদের ইতিহাসের সর্বযুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা একই রকম ছিল না। এক সময় রাজার ক্ষমতার কোন সীমা ছিল না। আইনপ্রণয়ন, শাস্তিদান এবং বিচার করার সর্বময় ক্ষমতাই ছিল রাজার। যুদ্ধ ঘোষণা করারও তার ছিল একক ক্ষমতা। আবার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং ন্যায়ের উৎসেও ছিলেন রাজা। তবে রাজার সর্বময় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধকরণেরও কিছু ব্যবস্থা ছিল, যাতে সে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে। প্রথম নিয়ন্ত্রক ছিল মহামন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ। যখন বাংলার পাল সম্রাট দ্বিতীয় মহীপাল এর সামন্তবর্গ বিদ্রোহ

করেছিল তখন তিনি তাঁর সদগুণ সম্পন্ন মন্ত্রিবর্গের উপদেশ অমান্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কেবল জীবনই হারান নি, একই সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলও হারিয়েছিলেন। বরেন্দ্র এলাকার সামন্তবর্গ রাজার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিলো (মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র)। আবার রামপাল যখন বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি করছিলেন তখন তাঁকে বিপুল সংখ্যক সামন্তকে ভূমিদানসহ বিভিন্ন উপঢৌকনের প্রলোভন দেখিয়ে পক্ষে টানতে হয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্ কাব্যে এ বিষয়ে বিসদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় যে সামন্তপ্রভুরা রাজক্ষমতার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতো। গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত বাংলার কিংবা সারা ভারতবর্ষেরই রাজনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো সামন্ততান্ত্রিক ছিল এবং এক অর্থে সামন্ততন্ত্র সমাজের শক্তিতো ছিলই আবার কখনো কখনো সমাজের দুর্বলতাও ছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুদের তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান কেবল বাংলাতেই না, সারা ভারতেই ছিল। বৈন্যগুপ্তের (৫০৭ খ্রি:) সময় সামন্ত বিজয়সেন ক্ষমতাশালী হয়ে মহাসামন্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং সাম্রাজ্যের সর্ব দক্ষিণ-পূর্বাংশে অসীম ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি শশাঙ্কও মহাসামন্তের অবস্থান থেকে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠে এসেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজবংশের প্রথম রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেলরাজাদের ক্ষমতার 'আধার' হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারীদের তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখান থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তাঁর উত্থান ঘটে। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেনও পাল সাম্রাজ্যে সামন্ত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং পালদের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করেন। অসংখ্য তাম্রশাসনে বিধৃত বহু দৃষ্টান্ত থেকে সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে আদি মধ্যযুগীয় (চার থেকে বারো শতক) শাসন ব্যবস্থায় সামন্তদের প্রভাব কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণ ও ফলাফল উভয়ই বলে বিবেচনা করা যায়।

(সূত্র- বাংলাপিডিয়া, আবদুল মমিন চৌধুরী)